মাস্টারমশাই

অভিরূপ সরকার

সেই সময়ের কথা বলছি যখন কলকাতা শহর থেকে নকশাল আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ সরে যাচ্ছে। শহরের দেয়ালে এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধীর সদ্য স্টেনসিল কাটা জ্বলজ্বলে ছবি। তার পাশে রোদ-ঝড় বৃষ্টিতে ফিকে হয়ে আসা চিনের চেয়ারম্যানের টুপি পরা প্রতিকৃতি ক্রম-অপস্রিয়মাণ। কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে বাংলাদেশ যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে তার বিজয়গৌরব ছড়িয়ে আছে। কংগ্রেসিরা বিধানসভার দখল নিয়েছে। তার জেরে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে, কলেজ স্ট্রিটে, কলেজ স্ট্রিট সংলগ্ন হ্যারিসন রোডে ও হিন্দু হস্টেলের সামনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে নিয়মিত নকশাল পেটানো হয়। ঠিক যেমন করে কয়েক বছর আগে নকশালরা তাদের চেয়ারম্যানের নাম করে বন্দেমাতরম্ওয়ালাদের পেটাত। মাত্রই কয়েক মাস হল প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি।

সে ছিল এক আশ্চর্য ঋতু। সে ঋতু ভালোবাসার, ঘৃণার, ঔদ্ধত্যের, বিনয়ের, সংশয়ের, সমর্পণের, তাচ্ছিল্যের, শ্রদ্ধার। সে এক ঋতু যখন বর্তমানটাই সব, অতীত অথবা ভবিষ্যৎ প্রায় অর্থহীন। এই মুহূর্তে যাকে গ্রহণ করছি, হয়ত কয়েকদিন পরেই বর্জন করছি তাকে। হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছি গোগ্রাসে গিলছি। রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-চণ্ডীদাসের পাশাপাশি ফরাসি-জার্মান-ইংরেজি কবিতা, রুশ উপন্যাসের সঙ্গে বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর, বাংলা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন, মার্কিনি থ্রিলার, ওডহাউস - কিছুই বাদ যাচ্ছে না। আর সবার উপরে মহীরুহের মত রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ করে তাঁর গান। যা পড়ছি তার বেশিরভাগটাই হজম হচ্ছে না, না বুঝে কফি হাউসের আড্ডায় চোঁয়া ঢেঁকুর তুলছি, কিন্তু যেটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছে, থেকে যাচ্ছে, তার দামও অনেক।

নকশাল ও বন্দেমাতরম্ওয়ালাদের ভূমিকাগুলো আমূল বদলে গিয়ে পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, এটা এখন আর তেমন আশ্চর্য লাগে না। ইতিহাসে এমন পুনরাবৃত্তি কতই তো ঘটে থাকে। এমনকি এটাও আশ্চর্য লাগে না যে, প্রথম যৌবনে দেখা সেই যুযুধান দু'পক্ষকেই আজকের নিরিখে বামপন্থী বলা চলে। সমাজতন্ত্রের শর্ত মেনে ইন্দিরা গান্ধী ততদিনে ব্যাঙ্ক, কয়লাখনি, উড়োজাহাজ, পর্যটন সবকিছুকেই রাষ্ট্রের দখলে এনে ফেলেছেন। আর নকশালরা তো আরও এক ধাপ এগিয়ে ধনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক বন্দোবস্তগুলোকেই তুলে দেবার মতলব এঁটেছিল। সে যাই হোক, এত দিন পরে পিছন ফিরে তাকালে কেবল এই ভেবে অবাক হয়ে যাই, কেমন করে সেই ঘোর বামপন্থী ধর্মীয় গোঁড়ামির যুগেও প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগে একটা আশ্চর্য মুক্ত পরিবেশ বজায় ছিল।

অর্থনীতি বিভাগটি ছিল রীতিমত তারকাখচিত। মাস্টারমশাইরা যাঁরা পড়াতেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই নিতান্ত স্নাতক স্তরে পড়াবার কথা ছিল না। বস্তুত, পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই দেশের নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার কেউ কেউ, শুধুমাত্র ছাত্র তৈরি করার তাগিদে, বেশ কিছুদিন অব্দি থেকেও গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সে যাই হোক, আমরা ছাত্ররা যে এক সঙ্গে অতগুলো ক্ষুরধার মস্তিষ্কের সংস্পর্শে এসে অসাধারণ লাভবান হয়েছিলাম, তাতে সন্দেহ নেই। এক-একজন মাস্টারমশাই-এর এক একরকম পড়াবার ঢঙ। কিন্তু একটা ব্যাপারে সকলেই একমত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী পড়া মুখস্ত করে পরীক্ষায় অনেক নম্বর পাওয়া গেলেও তার সঙ্গে প্রকৃত লেখাপড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে ক্লাশের বক্তৃতা সিলেবাসের চৌহদ্দি পেরিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ত।

এই স্বল্প পরিসরে সমস্ত তারকা অধ্যাপকদের কথা লেখা যাবে না। শুধু সেই দুজনের কথা লিখব যাঁরা আর নেই। তারকাদের ভিড়ে সব থেকে মুখচোরা, প্রায় লুকিয়ে থাকা অধ্যাপকটির নাম ছিল নবেন্দু সেন। তাকিয়ার খোলের মত সাদা বুশশার্টের ভিতর গৌরবর্ণ, কাঠিসার শরীর। তোবড়ানো গাল, টিয়া পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো লম্বা নাক, চশমার আড়ালে সদা-কুণ্ঠিত একজোড়া চোখ। একটু খেয়াল করে দেখলেই বোঝা যাবে চোখদুটো অসম্ভব সংবেদনশীল। নবেন্দুবাবুর বংশমর্যাদা ছিল। কিন্তু তিনি যে দীনেশচন্দ্র সেনের নাতি, কবি সমর সেনের তুতো ভাই, এই সত্যটা নিজের আভিজাত্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে ঢেকে রাখতেন। এ-হেন মার্জিত মানুষটাও পড়াশোনার সময় কেউ বিরক্ত করতে এলে কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠতেন।

একটা দিনের কথা বিশেষ করে মনে আছে। খুপরিতে আর কেউ নেই, অধ্যাপক নবেন্দু সেন একটা চারমিনার ধরিয়ে ক্লাশের পড়া তৈরি করছেন। উঁকি মারতেই বাঘের মত গলায় বললেন, এখন নয়, পরে। যারা নবেন্দুবাবুকে চেনে তারা জানে তিনি ওইরকম গলায় কথা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বলতেই পারেন না। তাই শুনতে ভুল হয়েছে ভেবে আর একবার উঁকি মারলাম। এবার চশমার আড়াল থেকে ঠান্ডা একজোড়া চোখের নীরব ভর্ৎসনা। আর পালানো ছাড়া গতি নেই। কয়েকটা জিজ্ঞাস্য ছিল, কিন্তু সেসব পরে দেখা যাবে। পালিয়ে সোজা ক্যান্টিন। দশটা বাজতে তখনও মিনিট কুড়ি বাকি আছে। দশটা থেকে নবেন্দুবাবু ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্লাশ নেবেন।

ক্লাশে পড়ানোর বেলায় কিন্তু রাজ্যের লজ্জা পেয়ে বসত তাঁকে। পড়াতে পড়াতে ছাত্রীদের দিকে তো বটেই, এমনকি ছাত্রদের দিকেও পারতপক্ষে তাকাতেন না। ক্লাশের পঞ্চাশ মিনিট তাঁর সম্বোধনের একমাত্র লক্ষ্য হত সম্মুখবর্তী সাদা দেয়ালটা। তাঁর মুখের ইংরেজি ভাষা ছিল অতিশয় মনোরম। খুব মন দিয়ে শব্দ বাছতেন, একবার one could say বলবেন নাকি one would say বলবেন এই দ্বিধা নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট ব্যয় করার পর পড়াই আর জমলো না। ক্লাশে নোট নেব কি, হাঁ করে তাঁর ইংরেজি শুনতাম।

একেবারে আত্মভোলা একটা মানুষ। একবার ক্লাশে ঢোকার পর সকলে লক্ষ করল নবেন্দুবাবুর ডান পায়ের কাবলি জুতোটি কালো রঙের আর বাঁ পায়েরটি বাদামী। তাছাড়া নকশার দিক থেকেও দু'পায়ের জুতোর মধ্যে বিশেষ মিল নেই। ক্লাশে ধীরে ধীরে একটা চাপা গুঞ্জন উঠছে, অথচ নবেন্দুবাবু কিছুই খেয়াল করছেন না, তিনি একমনে সামনের দেয়ালটিকে ভারতীয় রেলের পুরোনো ইতিহাস পড়িয়ে যাচ্ছেন। এদিকে গুঞ্জন ক্রমে বেড়েই চলেছে। অবশেষে নবেন্দুবাবুর মনে হল কিছু একটা গন্ডগোল ঘটেছে নির্ঘাত। তিনি পড়ানো থামিয়ে ঈষৎ বিভ্রান্তভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন এমন সময় নেহাতই দৈবক্রমে নিজের পায়ের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশে হাসির একটা রোল উঠল। নবেন্দুবাবুর সেই অপ্রস্তুত মুখটা কোনোদিন ভুলবো না। ক্লাশ শেষ হতে তখনও মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাকি আছে। নবেন্দুবাবু দাঁতে দাঁত চেপে ঘামতে ঘামতে পড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বারবার তাঁর চোখ পড়ে যাচ্ছে নিজের পায়ের দিকে। তাঁর অসহায় মুখটা দেখে ছাত্ররাও কিন্তু আর হাসতে পারছে না। আস্তে আস্তে ক্লাশে নীরবতা ফিরে এলো। মিনিট দশেকের মধ্যে সব স্বাভাবিক।

আরও একদিনের ঘটনা। নবেন্দুবাবু ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিবৃত্ত পড়াতে পড়াতে ছাত্রদের লক্ষ্য করতে বললেন, ১৯৪৮-৪৯ নাগাদ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ খুব কমে গিয়েছিল। এর একটা-দুটো সম্ভাব্য কারণ আলোচনা করার পর তিনি জানালেন আলোচিত কারণগুলোর কোনওটাই তাঁর কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। এ-নিয়ে নতুন কোনও ব্যাখ্যা ক্লাশে কেউ দিতে পারবে কি? এই শুনে জনৈক ফক্কড় ছাত্র লাফিয়ে উঠে বলল, 'Sir, did population growth slow down because the Father of the Nation died around that time?' নবেন্দুবাবু ছাড়া অন্য কারও ক্লাশে এই ফাজলামি অভাবনীয় ছিল।

নবেন্দুবাবু লেক গার্ডেন্সে থাকতেন। সাদার্ন এভিনিউ এবং ল্যান্সডাউনের সংযোগস্থল থেকে এল নাইন বাসে ধর্মতলা এবং সেখান থেকে কলেজ

প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকব রাজার মত, কলেজ স্ট্রীট দিয়ে, পুরোনো বই-এর দোকানে চোখ বোলাতে বোলাতে... আমার কাছে এটা জীবনের একটা মস্ত আনন্দ।' জীবন থেকে এমন অনাবিল আনন্দ নবেন্দুবাবুর মত ক'জন নিতে পেরেছে?

স্ট্রীটের ট্রাম ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, এই ছিল তাঁর দৈনিক যাতায়াতের রাস্তা। আমরা ভাবতাম, একটাই বাসে মহম্মদ আলি পার্ক অব্দি এসে সেন্ট্রাল এভিনিউ পার হয়ে কলেজের পেছন দিক দিয়ে ঢুকলেই তো হত। আবার ধর্মতলায় বাস বদলে ট্রামে ওঠা কেন? কেউ কেউ বলত, সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর যানবহুল চওড়া রাস্তা নবেন্দুবাবুর পক্ষে পার হওয়া অসম্ভব, তাই ধর্মতলায় গাড়িবদল করতেই হয়। অনেক দিন পরে, যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াচ্ছি, নবেন্দুবাবুকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। প্রশ্নটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'কেন ধর্মতলায় গাড়িবদল করি জান? চোরের মত চুপিচুপি পেছনের দরজা দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকব এটা ভাবতেই পারি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকব রাজার মত, কলেজ স্ট্রীট দিয়ে, পুরোনো বই-এর দোকানে চোখ বোলাতে বোলাতে। তোমাদের তুচ্ছ মনে হতে পারে। আমার কাছে এটা জীবনের একটা মস্ত আনন্দ।' জীবন থেকে এমন অনাবিল আনন্দ নবেন্দুবাবুর মত ক'জন নিতে পেরেছে?

নবেন্দুবাবু যখন খুব অসুস্থ, গোর্কি সদনের পাশে একটা নার্সিং হোমে ভর্তি আছেন, সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে যেতুম। কথা বলতে তখন তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে, তবু কথা বলতে চাইতেন, কথা বলতে পারলে খুশি হতেন। লক্ষ করেছিলাম, বাংলা শিশুসাহিত্য নিয়ে তাঁর অগাধ উৎসাহ। বিশেষ করে তিরিশ-চল্লিশ দশকের শিশুসাহিত্য নিয়ে। আমার কাছে সে এক নতুন নবেন্দু সেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জাপানি ডিটেকটিভ হুকাকাশির বিখ্যাত সব উপন্যাস - *ঘোষ চৌধুরির ঘড়ি, পদ্মরাগ*। রবীন্দ্রলাল রায়ের অসাধারণ সব হাসির গল্প - *মেসের মরীচিকা, দিনের খোকা রাতে*। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া। *রঙমশাল, রামধনু, মৌচাক*-এর পাতায় সেসব বেরোতো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৌলিক কল্পবিজ্ঞান *পৃথিবী ছাড়িয়ে*। শিবরাম চক্রবর্তীর বর্মার মামা। নরেন্দ্র দেবের *পাঠশালা* পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর ছোটদের কবিতা। ক'জন মনে রেখেছে এসব? নবেন্দুবাবু রেখেছিলেন। পরম মমতায় মনে রেখেছিলেন। এমন পরিশীলিত, অভিজাত, সংবেদনশীল মানুষ খুব বেশি দেখলাম না।

নবেন্দুবাবুর একেবারে বিপরীত মেরুতে বাস করতেন স্মার্ট, সাহেবি, অতীব সুপুরুষ অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। কৈশোর-যৌবনের সেই সন্ধিক্ষণে দীপকবাবুর নাগরিকতা, হেরিং বোন টুইডের বিলিতি ব্লেজার, টাই-এর নিখুঁত নট, বিশুদ্ধ বিলিতি উচ্চারণের ইংরেজি

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

আমাদের যুগপৎ ভীত ও মুগ্ধ করেছিল। সাহেবরা যাকে বলে awe। বস্তুত, তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে বুঝতেই কলেজের প্রথম বছরটা কেটে গেল। তাঁর রসিকতাও ছিল প্রবাদপ্রতিম। সে রসিকতায় বিলক্ষণ হুল থাকত, মাঝে মধ্যে কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুরতা।

সেযুগে IS এবং LM নামধারী দু'টি রেখাচিত্রের সাহায্যে কেনসীয় অর্থনীতির সারাৎসার বোঝানো হত, বোধকরি এখনও হয়। সবে সেসব শিখছি এমন সময় একদিন টিউটোরিয়াল ক্লাশে আমাদের এক সহপাঠীকে দীপকবাবু ব্ল্যাকবোর্ডে রেখাচিত্র দু'টি এঁকে বোঝাতে বললেন। ছেলেটি রেখাচিত্র দু'টি ঠিকই আঁকল, শুধু তাড়াহুড়োতে কিংবা নিছক অজ্ঞানতাবশত IS-কে লিখল LM আর LM-কে IS। অঙ্কনপর্ব শেষ হবার পর দীপকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী আঁকলে'? 'ওই যে স্যার, IS-LM আঁকলাম', ছেলেটি জানালো। শুনে দীপকবাবুর ভর্ৎসনা, 'তুমি এত মিথ্যে কথা বল কেন বলত?' পরের দিন ক্লাশের পড়ানো শেষ করে সেই ছেলেটিকে দীপকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অতনু (আসল নামটা বদলে দিলাম, ছেলেটি এখন একজন দায়িত্বশীল, বরিষ্ঠ আমলা), বুঝতে পারছ?' অতনু কুন্ঠিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ স্যার।' ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সকলকে শুনিয়ে দীপকবাবুর স্বগতোক্তি, 'কী আশ্চর্য'।

পরে অবশ্য যত বেশি তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, তত বুঝতে পেরেছি তাঁর আপাত-উন্নাসিক চেহারাটার আড়ালে একটা প্রকৃত মানবিক, ছাত্রদরদী উদার-হৃদয় মাস্টারমশাই বাসা বেঁধে ছিল। বস্তুত, ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও প্রশ্রয়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। আর উন্নাসিকতা যদি কিছুমাত্র থেকে থাকে তাহলে তা ছিল কেবল প্রচলিত ইঁদুর-দৌড়ের প্রতি। এই উন্নাসিকতাবশত তিনি ডক্টরেট ডিগ্রিটাও শেষ করলেন না, অথচ তাঁর তত্ত্বাবধানে অতি উচ্চমানের ডক্টরাল থিসিস লেখা হয়েছে। নকুড়ের সন্দেশ, আমীর খাঁর খেয়াল, বিলায়েত খাঁ বা নিখিল বাঁড়ুজ্জের সেতার, উৎকৃষ্ট স্কচ এইরকম কয়েকটি পরম আদরের জিনিস নিয়ে তিনি রাজার মত জীবন কাটালেন। তথাকথিত পান্ডিত্যের খ্যাতি বা জীবনের অন্যান্য ফলক, যা হাসিল করতে গেলে মাঝে-মধ্যে একে-ওকে ল্যাং মারতে হয়, একগাদা ভক্ত জুটিয়ে দলবাজি করতে হয়, দীপকবাবু সেসব অনায়াসে অবজ্ঞা করে গেলেন। কিন্তু, বছরের পর বছর যেসব ছাত্রদের তিনি হাতে ধরে অর্থনীতির অ-আ-ক-খ শিখেছিলেন, আর তার থেকেও বড় কথা অর্থনীতি নামক বিষণ্ণ বিজ্ঞানটির ভিতরে যে-গোপন মজা ও উত্তেজনা লুকিয়ে আছে তার সন্ধান দিয়েছিলেন, তারা প্রত্যেকে তাঁকে পরম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

দীপকবাবুর সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা কার্যত অসম্ভব ছিল। একবার এক ছাত্র, সে তখন তৃতীয় বর্ষে উঠে খানিকটা লায়েক হয়েছে, দীপকবাবুকে বলল, 'আপনি কিন্তু স্যার গত তিন বছর ধরে একই প্রশ্ন পরীক্ষায় দিয়ে যাচ্ছেন।' তার ভাবখানা এই, আপনি প্রশ্ন তৈরির ব্যাপারে যতটা পরিশ্রম করা দরকার ততটা করছেন না। দীপকবাবু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'প্রশ্ন তো একই করছি, কিন্তু উত্তর কি এক পাচ্ছি?'

আর একবার, বছর পনের-কুড়ি আগে, প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ মানসুর ওলসন দলবল নিয়ে কলকাতায় এসেছেন, সেই দলে পরবর্তীকালের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অলিভার উইলিয়ামসনও আছেন। মধ্য কলকাতার এক নামজাদা হোটেলে এঁদের বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। এঁরাই বক্তৃতা দেবেন, স্থানীয়দের দায়িত্ব হয় কোনো অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা অথবা কোনো বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করা। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গবেষণা কেন্দ্র এই বক্তৃতার আয়োজন করেছে। সেই কেন্দ্রটির প্রভূত টাকা-পয়সা, তারা সভাপতি এবং আলোচকদের প্রত্যেককে সাড়ে-সাত হাজার করে টাকা সম্মান-দক্ষিণা দিচ্ছে। তৎকালীন সরকারের ঘনিষ্ঠ কলকাতার জনৈক বামপন্থী অর্থনীতিবিদ দেখলাম সভাপতিত্ব করে সম্মান-দক্ষিণাটিও হাত পেতে নিলেন। তারপর মধ্যাহ্নভোজনের সময় খাবারের লাইনে দাঁড়িয়ে শুনি তিনি দীপকবাবুকে বলছেন, 'বুঝলেন, এরা সব দালাল, দালাল।' সঙ্গে সঙ্গে দীপকবাবুর উত্তর, 'আজকাল দালাল তো দেখি অনেকেই, প্রশ্ন হল, কে কার দালাল। আপনাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটা গল্প বলি। গাঁয়ের পুকুর পাড়ে একটি মেয়ে আর একটি মেয়েকে বলছে, ছি, ছি, তুই পরপুরুষের ঘর করিস! আমি তো ভাসুর ঠাকুরের ঘর করি।'

হিন্দুস্তানি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল দীপকবাবুর। বিশেষ করে আমীর খাঁ সাহেবের কথা উঠলে নিজেকে আর সামলাতে পারতেন না। এক বন্ধুর কাছে শোনা গল্প। বন্ধুটি সঙ্গীত-প্রেমিক, কলেজের কোনও পরীক্ষার আগের রাত্তিরে পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে কলামন্দিরে গান শুনতে গেছে। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। বিরতির সময় বেরিয়ে চাতালে চা খেতে খেতে একেবারে খোদ দীপকবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি। দীপকবাবু তখন বিভাগীয় প্রধান। আমার বন্ধুটিকে দেখে কড়া গলায় বললেন, 'এদিকে এস।' বন্ধুটি ভাবছে, সর্বনাশ হয়ে গেল। কাল তো দীপকবাবুর বিষয়েরই পরীক্ষা। পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার জন্য বেজায় গাল খেতে হবে। ভয়ে ভয়ে সে দীপকবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দীপকবাবু বললেন, 'কাল তো তোমাদের মাইক্রোইকনমিক্স পরীক্ষা। কেমন পড়াশোনা করেছ সেটা পরীক্ষার খাতা দেখলেই টের পাওয়া যাবে। এখন সোজা সামনের দিকে তাকাও। ওই যে চশমা পরা মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছ, ওঁর নাম আমীর খাঁ। ওঁর তুল্য খেয়ালিয়া ভারতবর্ষে নেই। দেখে নাও। এত কাছ থেকে দেখার এমন সুযোগ আর কখনও পাবে না।'

দীপকবাবুর মুখে শোনা আমীর খাঁ সাহেবের আর একটা গল্প। গল্পটা আমাকেই বলেছিলেন। একবার ষাট দশকের শেষ দিকে আমীর খাঁ সাহেবকে দীপকবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'খাঁ সাব, বিস-বাইস সাল পহলে আপনে তো শের জ্যায়সে তান করতে থে। লেকিন আজকাল আপ জ্যাদা তান নেহি করতেঁ। অ্যায়সা কিঁউ? আমীর খাঁ উত্তর দিয়েছিলেন, 'চলো আচ্ছা হুয়া। ম্যায় জানোয়র সে ইনসান বন গয়া।'

নবেন্দুবাবু বা দীপকবাবু কেউই আর নেই। তাঁরা দুজনেই শুধু লেখাপড়া নয়, নিজেদের মত করে একটা বেঁচে থাকার রাস্তা, জীবনদর্শন কথাটায় আপত্তি না থাকলে তা-ই, আমাদের শিখিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ নিতে পেরেছি, কেউ পারিনি। কিন্তু শেয়াল আর গাধাদের মানুষ বানানোর চেষ্টায় তাঁদের খামতি ছিল না।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073